৪

মুঘল ও মুঘল পরবর্তী যুগে বাংলা

বাংলায় মুঘল বিজয়ের সূত্রপাত ঘটে সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে মুঘল শাসনের সূচনা করেন। কিন্তু বাংলায় তাঁর অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরের বছর চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রি:) হুমায়ুনের পরাজয়ের পর বিজয়ী আফগান নেতা শের খান এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে গৌড় আক্রমণ করেন। তিনি মুঘল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলীকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড় দখল করেন এবং বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কররানী আফগান বংশের রাজত্বকালের শেষদিকে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা জয়ের পরিকল্পনা করেন এবং তাঁর সেনাপতিরা সামরিক অভিযান শুরু করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল ও আফগানদের মধ্যে সংঘটিত রাজমহলের যুদ্ধের ফলে বাংলায় আফগান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সূচিত হয় মুঘল শাসন। তবে সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সময় লাগে। নদীমাতৃক বাংলা প্রদেশের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জমিদারদের প্রতিরোধের কারণে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত একটি সুবা অর্থাৎ প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে আকবরের শাসনকাল হতেই বাংলায় সুবাদার নিয়োগ শুরু হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবাদার ইসলাম খান 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত বাংলার জমিদারদের কঠোর হস্তে দমন করে এদেশে মুঘল শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। অন্যান্য যে সকল সুবাদার তাঁদের কর্মকান্ড দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন

তাঁদের মধ্যে মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলী খান ও আলীবর্দী খানের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের সুবাদারী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বাংলার শাসনকাল 'নবাবী যুগ' নামে অভিহিত। এ সময়ে বাংলা প্রদেশের ওপর মুঘল কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে এবং বাংলা কার্যত স্বাধীন ছিল। মুর্শিদকুলী ও তাঁর পরবর্তী সুবাদারগণ নামমাত্র মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতেন। সুবাদার পদে নিজেদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁরা বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেন বংশগত শাসন। মুঘল সম্রাট ফরমান জারি করে তাঁদের ক্ষমতাকে বৈধতা দিতেন।

এ ইউনিটটি পাঠ করে আপনারা বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা, মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে সুবাদারী শাসন এবং কয়েকজন মুঘল সুবাদারের কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. আকবরের বাংলা বিজয়
- পাঠ-২. বার ভূঁইয়া ও ইসলাম খান চিশতী
- পাঠ-৩. শায়েস্তা খান
- পাঠ-৪. মুর্শিদকুলী খান
- পাঠ-৫. আলিবর্দী খান

পাঠ - ১

আকবরের বাংলা বিজয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মুঘল অধিকারের পূর্বে কারা বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন সে সম্পর্কে জানবেন;*
- *সম্রাট আকবরের বাংলা জয়ের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;*
- *আকবরের সময়কালে বাংলা বিজয়ের বর্ণনা দিতে সক্ষম হবেন।*

মুঘল অধিকারের পূর্বে বাংলার শাসকগণ

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে কররানী আফগান বংশ বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কররানীর মৃত্যুর পর সুলায়মান খান কররানী বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ শাসক। আফগান সর্দারদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে তিনি বিপুল সামরিক শক্তি গড়ে তোলেন। কার্যত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হলেও তিনি প্রকাশ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবিদার ছিলেন না। সম্রাট আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তিনি তাঁকে মূল্যবান উপহার পাঠাতেন এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কিত করেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বায়েজিদ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আমীর-ওমরাহগণ তাঁকে হত্যা করে সুলায়মানের অপর পুত্র দাউদ কররানীকে সিংহাসনে বসান। তিনি ছিলেন অদূরদর্শী শাসক। পিতার অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে তিনি বাদশাহ উপাধি ধারণ করে স্বীয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণা

করেন। শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও বিশাল রাজ্যের অধিকারী হয়ে দাউদ নিজেকে মুঘল সম্রাট আকবরের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন। তিনি নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারির ব্যবস্থা করেন। এতে সম্রাট আকবর কররানী রাজ্য আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যান।

সম্রাট আকবরের বাংলা জয়ের কারণ

শুধু দাউদ কররানীর অনুসৃত নীতির ফলেই যে আকবর বাংলা আক্রমণ করেছিলেন, তা নয়। তাঁর বাংলা জয়ের পেছনে আরো কারণ ছিল। সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে তিনি একের পর এক রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন। গুজরাট অধিকারের পর আকবর কররানী রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তাই এটা স্পষ্ট যে, বাংলা বিজয় ছিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অংশ। দ্বিতীয়ত, তাঁর পিতা হুমায়ুন এক সময় বাংলা অধিকার করেছিলেন। চৌসার যুদ্ধের পর শেরশাহ বাংলা দখল করেন। তাই পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করতেন। তৃতীয়ত, মুঘলরা আফগানদের পরাজিত করে ভারতের ক্ষমতা দখল করেছিল। তাই পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সুযোগ পেলেই যে আফগানরা মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে সে আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শক্তিধর আফগান রাজ্য হতে যে কোন সময় মুঘলদের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণে কররানী রাজ্য জয় করে আফগান শক্তি নির্মুল করা অতীব জরুরী কাজ বলে আকবর বিবেচনা করেছিলেন।

বাংলা বিজয়ের বিবরণ

সুলায়মান কররানীর জীবদ্দশায় সম্রাট আকবর কররানী রাজ্য আক্রমণের সুযোগ পাননি। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট অভিযানকালে সম্রাট আকবর সুলায়মান কররানীর মৃত্যু সংবাদ পান। সে সময় অনেকে সম্রাটকে গুজরাট অভিযান স্থগিত রেখে বাংলা আক্রমণের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। তিনি জৌনপুরের মুঘল শাসনকর্তা মুনিম খানকে কররানী রাজ্য জয় করার নির্দেশ দেন।

মুনিম খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে বিহার আক্রমণ করে। দাউদ কররানী তাঁর বিশ্বস্ত উজির লোদি খানকে মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠান। লোদি খান নগদ তিন লক্ষ টাকা ও মূল্যবান উপহার করস্বরূপ দিতে রাজি হওয়ায় মুঘল সেনাপতি এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করেন। সম্রাট আকবর এতে মুনিম খানের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে পুনরায় কররানী রাজ্য অধিকারের নির্দেশ দেন।

মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বিহার আক্রমণ করেন। ইতোমধ্যে দাউদ কররানী তাঁর সুযোগ্য উজির লোদি খানকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দি ও হত্যা করেন। এর ফলে মুঘলদের প্রতিরোধে যোগ্য সামরিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। মুনিম খান ও তাঁর বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে দাউদ কররানী ও তাঁর সেনাপতিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাঁরা পাটনা দুর্গে আশ্রয় নেন এবং দুর্গ সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাটনা দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু প্রায় নয় মাস অবরোধের পরও তিনি দুর্গ অধিকারে ব্যর্থ হন। তখন সম্রাট আকবর নিজেই বিহার অভিযানে অগ্রসর হন। তিনি শক্তি প্রয়োগে পাটনার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয়ের পরিবর্তে এক ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। যে হাজীপুর শহর থেকে পাটনা দুর্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ আসতো তিনি সুকৌশলে তা দখল করে দুর্গের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। এতে দাউদ কররানী ও তাঁর সেনাপতিরা নিরাশ হয়ে পড়েন এবং পাটনা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। আকবর পাটনা অধিকার করে কিছুদূর পর্যন্ত পলায়মান আফগানদের

অনুসরণ করেন। শেষে মুনিম খানের ওপর অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে তিনি রাজধানী আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মুনিম খান সম্রাটের নির্দেশ মোতাবেক দাউদ কররানীকে অনুসরণ করে একে একে সুরথগড়, মুঙ্গের ও ভাগলপুর অধিকার করেন এবং শেষে কররানী রাজ্যের রাজধানী তান্ডায় প্রবেশ করেন। দাউদ এ সময়ে সপ্তগ্রাম অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার দিকে চলে যান। তাঁকে অনুসরণ করে মুঘল বাহিনী সপ্তগ্রামের দিকে অগ্রসর হলে দাউদ কররানী উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মুনিম খানের অধীনে মুঘল বাহিনী উড়িষ্যায় দাউদের অনুসরণ করে এবং তুকারয় নামক স্থানে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় (মার্চ, ১৫৭৫ খ্রিঃ)। যুদ্ধে দাউদের পরাজয় ঘটে এবং তিনি কটক দুর্গে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তিনি মুনিম খানের সঙ্গে কটকের সন্ধি (১২ এপ্রিল, ১৫৭৫ খ্রিঃ) স্থাপন করেন। উক্ত সন্ধিতে স্থির হয় যে বাংলা-বিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হবে এবং দাউদ সম্রাটের সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসন করবেন। আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ দাউদ সম্রাটের জন্য বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাঠান।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দাউদ কররানী কটকে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করেন। মুঘল সেনাপতি ও শাসনকর্তা মুনিম খান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে রাজধানী তান্ডায় মৃত্যুবরণ করলে মুঘল সৈন্যদের মধ্যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সুযোগে দাউদ কররানী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজধানী তান্ডায় স্বীয় অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল সৈন্যরা বাংলা ত্যাগ করে বিহারে আশ্রয় নেয়।

সম্রাট আকবর মুনিম খানের মৃত্যু এবং দাউদের সন্ধি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা খান জাহান হোসেন কুলী খানকে বাংলার শাসনকর্তা ও সেনাপতি নিয়োগ করেন। রাজা টোডরমল তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁরা উভয়ে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আগ্রা হতে বিহার অভিমুখে রওনা হন। বিহারে আশ্রয় গ্রহণকারী মুঘল সৈন্যদের সাথে তাঁদের সাক্ষাত ঘটে ভাগলপুরে। খান জাহানের নেতৃত্বে বিশাল মুঘল বাহিনী বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। তেলিয়াগর্হিতে একদল আফগান সৈন্য তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মুঘলদের প্রচন্ড আক্রমণে তারা পালাতে বাধ্য হয়। দাউদ কররানী রাজমহলের প্রবেশ পথে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেন। তখন সম্রাটের নির্দেশে বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি আরো সৈন্য নিয়ে খান জাহানের সঙ্গে যোগ দেন। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের নিকটে এক প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় মুঘল ও আফগানদের মধ্যে। এ যুদ্ধ রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে দাউদ কররানী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দি হন। পরে মুঘল সেনাপতিরা তাঁকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করে। এর ফলে বাংলায় কররানী আফগান বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।

সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলায় মুঘল শাসনের সূত্রপাত হলেও তখন সমগ্র বাংলার ওপর মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খান জাহান রাজমহলের যুদ্ধের পর রাজধানী তান্ডায় প্রবেশ করেন। তিনি মুঘল প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সপ্তগ্রাম অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা ও ঘোড়াঘাট বা উত্তরবঙ্গ অঞ্চল অধিকারে নেন। বিজয়ী মুঘল বাহিনী পূর্ব বাংলায়ও তাদের অভিযান পরিচালনা করে। মুঘলদের উপস্থিতিতে ভাওয়াল অঞ্চলের জমিদাররা সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ভাটি এলাকার জমিদাররাও প্রথমে মুঘল আধিপত্য মেনে নেন। কিন্তু খান জাহানের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর বৃহৎ জমিদাররা মুঘল শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এরফলে মুঘল শাসন কার্যত বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। জমিদারদের দমন করার জন্য সম্রাট আকবর শাহবাজ খান, উজির খান ও রাজা মানসিংহ-এর মতো সেনাপতিদের বাংলার সুবাদার করে পাঠান। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে বাংলার এসব সামন্ত ভূস্বামীদের স্থায়ীভাবে পদানত করা সম্ভব হয়নি। এ কাজটি সম্পন্ন হয় তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনকালে।

সারসংক্ষেপ

সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের উদ্যোগ ছিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অংশ। তাছাড়া যে আফগানদের হাত থেকে মুঘলরা ভারতবর্ষের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় সে আফগান শক্তিকে নির্মূল করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন। সে উদ্দেশ্যে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নির্দেশে মুঘল সেনাপতিরা বাংলা আক্রমণ করেন। কররানী আফগান বংশের শেষ শাসক দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে পরিচালিত মুঘল অভিযানের সর্বশেষ ঘটনা ছিল ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের রাজমহলের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিজয়ী মুঘল সেনাপতি খান জাহান বাংলায় মুঘল শাসনের সূচনা করেন। পশ্চিম এবং উত্তরবঙ্গ অধিকার করে মুঘল বাহিনী পূর্ব বাংলায়ও সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু ভাটি এলাকার সামন্ত ভূস্বামীদের সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্রাট আকবরের সেনাপতিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে কারণে সম্রাট আকবরের সময়কালে বাংলা প্রদেশ বিজিত হলেও মুঘল শাসন কার্যত বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শহর ও দুর্গ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। সমগ্র বাংলার ওপর মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় আকবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুলকরিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০–১৮৫৭ খ্রি.)*।
২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*।
৩. Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1(A)
৪. J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol. II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কররানী আফগান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(ক) দাউদ কররানী (খ) তাজ খান কররানী
(গ) সুলায়মান খান কররানী (ঘ) বায়েজিদ কররানী।

২। মুনিম খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিহার আক্রমণ করে?
(ক) ১৫৬৮ খ্রিঃ (খ) ১৫৭০ খ্রিঃ
(গ) ১৫৭২ খ্রিঃ (ঘ) ১৫৭৪ খ্রিঃ।

৩। দাউদ কররানীর রাজধানী কোথায় ছিল?
(ক) রাজমহল (খ) গৌড়
(গ) সপ্তগ্রাম (ঘ) তান্ডা।

৪। কটক দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল?
(ক) বিহার (খ) উড়িষ্যা
(গ) দাক্ষিণাত্য (ঘ) মুর্শিদাবাদ।

৫। রাজমহলের যুদ্ধ কখন অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৫৭৫ খ্রিঃ (খ) ১৫৭৬ খ্রিঃ
(গ) ১৫৭৭ খ্রিঃ (ঘ) ১৫৮৬ খ্রিঃ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট আকবরের বাংলা জয়ের কারণ উল্লেখ করুন।
২। মুনিম খান সম্পর্কেযা জানেন লিখুন।
৩। দাউদ কররানী সম্পর্কেএকটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন।
২। সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দিন।

পাঠ - ২

বার ভূঁইয়া ও ইসলাম খান চিশতী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *বার ভূঁইয়া বলতে কাদেরকে বুঝায় এবং তাঁদের উৎপত্তি কিভাবে হলো সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতী কিভাবে বার ভূঁইয়াদের দমন করেছিলেন সে বর্ণনা দিতে পারবেন।*

বার ভূঁইয়া কারা এবং তাঁদের উৎপত্তির ব্যাখ্যা

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হলেও এখানে তখন কার্যকরভাবে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। উত্তর-পশ্চিম বাংলার নগর ও দুর্গ এলাকায় মুঘল শাসন সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার বিখ্যাত জমিদারগণ মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এসব জমিদারদের নিজস্ব নৌবহর ও সৈন্যদল ছিল। তাঁরা সম্মিলিতভাবে মুঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা সমরনায়কদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাংলার ইতিহাসে এসব জমিদাররা বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত। বার ভূঁইয়া বলতে বারজন প্রসিদ্ধ ভূ-স্বামী বুঝালেও আসলে এসব জমিদারদের সংখ্যা ছিল অনেক। মুসলমান এবং হিন্দু– উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এ জমিদারগণ।

মুঘল বিজয়ের প্রাক্কালে অনেক ভূঁইয়া বা জমিদার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। এদের অনেকে বিভিন্ন জায়গীরদার বা ইজারাদারদের বংশধর ছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারীর মালিক হয়েছেন। তাছাড়া আফগানদের পতনের পর কোন কোন পাঠান সর্দার বাংলায় আশ্রয় নেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা স্বাধীন জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। ড. আবদুল করিমের মতে, বাংলায় বার ভূঁইয়াদের উৎপত্তি হয় আফগান শাসনামলে। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লিতে যেমন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, বাংলায়ও তদ্রূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে উদ্ভব হয় বার-ভূঁইয়াদের। গৌড় বা তান্ডার কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি অনুগত থাকলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীন ছিলেন। পরবর্তীতে এ জমিদাররা মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

বার ভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন সোনারগাঁও-এর জমিদার ঈশা খান এবং পরে তাঁর পুত্র মুসা খান। ভাওয়াল অঞ্চলে গাজী পরিবার ছাড়াও অন্য দু'জন বড় জমিদার ছিলেন মজলিস পরতাপ ও মজলিস কুতুব। ফতেহ খান দক্ষিণ সিলেটে, করিমদাদ মুসাজাই ও ইব্রাহিম মোড়ল কিশোরগঞ্জে, আনোয়ার খান বানিয়াচঙ্গে, তাজ খান ও সলিম খান হিজলী এবং শামস খান বীরভূমের জমিদার ছিলেন। পাবনা অঞ্চলে মাসুম খান কাবুলী ও তাঁর পুত্র মির্যা মুমিন শক্তিশালী জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আফগান দলনেতাদের মধ্যে সাহসী ব্যক্তিত্ব ওসমান খান লোহানী এবং বায়জিদ কররানী শ্রীহট্ট অঞ্চলে সামন্ত শাসকের মতো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে হিন্দু ভূস্বামীরাও ছিলেন। এদের মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য,

বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, শাহাজাদপুরের রাজা রায়, চান্দ্রপ্রতাপ বা মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় ও মধু রায়, চন্দ্রদ্বীপের পরমান্দ রায়, ভুলুয়ার অনন্ত মানিক্য ও লক্ষণ মানিক্য, বাঁকুড়ার বীর হামির ছিলেন প্রধান। বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এসব জমিদারগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সোনারগাঁও-এর জমিদার ঈসা খানের নেতৃত্বে জমিদারদের বাহিনী সম্রাট আকবরের সেনাপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের পরাভূত করেন। সেজন্য সম্রাট আকবরের শাসনকালে বাংলার অধিকাংশ জায়গায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

সুবাদার ইসলাম খানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

বার ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। পর পর কয়েকজন সুবাদার বিদ্রোহী সামন্ত ভূস্বামীদের দমন করতে ব্যর্থ হলে সম্রাট জাহাঙ্গীর অবশেষে ইসলাম খান চিশতীকে সুবাদার নিয়োগ করে বাংলায় পাঠান। ফতেহপুর সিক্রীর শেখ সলিম চিশতীর দৌহিত্র ইসলাম খান ছিলেন একজন সুনিপুণ যোদ্ধা ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা। দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সহজেই অনুধাবন করেন যে, বার ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানকে দমন করতে পারলে তাঁর পক্ষে অন্যান্য জমিদারদের পরাভূত করা সহজ হবে। তাছাড়া বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার বিবেচনায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, তখনকার রাজধানী প্রদেশের এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় সেখান থেকে সমগ্র বাংলার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছিল অসম্ভব। তাই তিনি রাজমহল হতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। নদীমাতৃক বাংলায় জমিদারদের নৌশক্তির মোকাবিলা করার জন্য তিনি মুঘল নৌবহরকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করেন। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একদিকে তিনি কূটনীতির মাধ্যমে জমিদারদের ঐক্য ভাঙ্গার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে স্থল ও জল উভয় পথেই সামরিক অভিযানের ব্যাপক আয়োজন করেন।

বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান

ইসলাম খান যখন রাজমহল হতে ঘোড়াঘাট পৌঁছেন তখন যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। মুঘল আক্রমণে ভীত হয়ে বাঁকুড়ার বীর হামির, বীরভূমের শামস খান ও হিজলীর সলিম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের আনুগত্য মেনে নেন। কিছুদিন ব্যর্থ প্রতিরোধের পর ভূষণা অঞ্চল অর্থাৎ ফরিদপুরের জমিদার সত্রজিৎ পরাজয় স্বীকার করেন। সত্রজিৎ-এর সহযোগিতায় মুঘল বাহিনী মজলিস কুতুবের ফতেহবাদও অধিকার করে।

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইসলাম খান ঘোড়াঘাট হতে পাবনার শাহজাদপুর পৌঁছেন এবং বার ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানের সুরক্ষিত যাত্রাপুর দুর্গ আক্রমণ করেন। এ অঞ্চলের ডাকচরায় জমিদারদের আরো একটি দুর্গ ছিল। মুসা খানের নেতৃত্বে জমিদাররা মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘলদের তীব্র আক্রমণে উভয় দুর্গের পতন ঘটে এবং মুসা খান ও তাঁর মিত্ররা পলায়ন করতে বাধ্য হন। অতপর ইসলাম খান চিশতি ঢাকার দিকে অগ্রসর হন এবং বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন (১৬১০ খ্রিস্টাব্দে) এবং এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। রাজধানী শহরের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও তিনি গ্রহণ করেন।

ঢাকা মুঘল অধিকারে আসার পর ইসলাম খান সোনারগাঁও অভিমুখে অগ্রসর হন। এ সময়ে মুসা খান ও তাঁর মিত্ররা লক্ষ্যা নদীতে মুঘলদের বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁরা নদীর পূর্ব তীরের দুর্গগুলো সুরক্ষিত করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মুঘলদের সাথে মুসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের নৌযুদ্ধ শুরু হয়। মুঘল বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে মুসা খানের কত্রাবু দুর্গ অধিকার করে। এরপর তাঁরা কদমরসুল সহ মুসা খানের আরো কয়েকটি দুর্গ দখল করে। অবস্থার বিপর্যয়ে মুসা খান সোনারগাঁও প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু রাজধানী নিরাপদ নয় ভেবে তিনি মেঘনা নদীতে অবস্থিত ইব্রাহিমপুর দ্বীপে আশ্রয় নেন।

মুঘল বাহিনী সোনারগাঁও দখল করে নেয়। মুসা খানের মিত্রবাহিনীভূক্ত কয়েকজন জমিদার যেমন, বাহাদুর গাজী, মজলিস কুতুব ও শামসুদ্দিন বাগদাদী এ সময়ে মুঘল সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করায় ইসলাম খান তাঁদেরকে স্ব স্ব জমিদারী জায়গীর স্বরূপ ভোগ করার সদয় অনুমতি দেন। এ অবস্থায় বার ভুঁইয়াদের প্রধান নেতা মুসা খান অসহায় হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে তিনিও পরাজয় স্বীকার করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের আনুগত্য মেনে নেন।

মুসা খানের আত্মসমর্পণের পর অন্যান্য বিদ্রোহী জমিদারদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তাঁরা মুঘল আধিপত্য মেনে নেয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ বা বাক্‌লার জমিদার রামচন্দ্র। যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য প্রথম দিকে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও পরে বিরোধিতা করেন। তাঁর ছিল এক বিশাল রাজ্য, অনেক রণপোত এবং সৈন্যদলও ছিল অনেক বড়। সলকা নামক স্থানে তৈরি তাঁর দুর্গকে তিনি দুর্ভেদ্য ভেবেছিলেন। ইসলাম খান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। সেনাপতি গিয়াস খান ও মির্যা নাথনের অধীনে মুঘল বাহিনী প্রতাপাদিত্যের সলকা দুর্গ অবরোধ করলে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য বাধা দিয়ে ব্যর্থ হন। পরে প্রতাপাদিত্য কাগরঘাটা দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করে মুঘলদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এখানেও শোচনীয় পরাজয় বরণ করে শেষে তিনি আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে ঢাকায় আনা হয়। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সেনাপতি গিয়াস খানকে যশোহরের শাসক নিযুক্ত করা হয়। ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত মানিক্য মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার না করায় তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তিনি পরাজিত হন এবং শেষে আরাকানে পলায়ন করেন। তাঁর শাসিত অঞ্চলও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বর্তমান সিলেট জেলায় অবস্থিত বুকাইনগরের আফগান জমিদার ওসমান খান লোহানী ছিলেন মুঘল বিরোধী শক্তির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। মুসা খানের বশ্যতা স্বীকারের পরও তিনি মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর বুকাইনগর রাজ্য খুব বিশাল ছিল না, কিন্তু তিনি ছোট বড় কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করে তাঁর রাজ্যকে দুর্ভেদ্য করে রাখেন। এবার ইসলাম খান ওসমানের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। কয়েকটি খন্ড যুদ্ধের পর ওসমান বুকাইনগর ছেড়ে পালিয়ে যান এবং সিলেটের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেন। মুঘল বাহিনী বুকাইনগর দুর্গ অধিকার করতে সক্ষম হলেও ওসমান খানকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়। পরের বছর ইসলাম খান সুজাত খানের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ওসমানের বিরুদ্ধে পাঠান। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার দৌলতপুর নামক স্থানে উভয়পক্ষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ওসমান খান পরাজিত ও নিহত হন। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর সৈন্যরা অনন্যোপায় হয়ে সুজাত খানের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। শ্রীহট্টের আরেকজন আফগান জমিদার বায়জিদ কররানীও তখন মুঘল বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ফলে সমগ্র সিলেট অঞ্চল মুঘল কর্তৃত্বাধীনে আসে।

ইসলাম খানের সুবাদার নিযুক্তির মাত্র ৪ বছরের মধ্যে বাংলার বিশাল এলাকায় মুঘল বিজয় সূচিত হয়। উত্তরে ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে রাজমহল থেকে পূর্বদিকে সিলেট ও দক্ষিণ-পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মুঘল শাসনাধীনে আসে। এর পরে ইসলাম খান উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী কোচবিহার, কামরূপ ও কাছাড়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় ইসলাম খান কামরূপ জয় করেন। তিনি ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কাছাড়ের রাজা প্রতাপনারায়ণ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। ফলে কাছাড়ও বিজিত হয়। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে সুবাদার ইসলাম খান মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইসলাম খানের কৃতিত্ব

বার ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা সুবাদার ইসলাম খানের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আকবরের সময়ের বিখ্যাত সেনাপতিরা বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। কিন্তু ইসলাম খান মাত্র চার বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলা জয় করে মুঘল শাসন সুদৃঢ় করেন। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তিনি যেমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তেমনি তাঁর সাংগঠনিক শক্তিও প্রশংসনীয় ছিল। একজন বিচক্ষণ রণকুশলী ও শাসক হিসেবে ইতিহাসে তাঁর স্থান উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। রাজমহলে এসেই তিনি বাংলার ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদীর গতিপথ এবং বিভিন্ন স্থানের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। নদীমাতৃক বাংলায় বার ভূঁইয়াদের দমনের উদ্দেশ্যে তিনি নৌবাহিনী শক্তিশালী করেন এবং পূর্ব বাংলার ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি কূটকৌশলের মাধ্যমেও তিনি জমিদারদের শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করেন। বাংলায় মুঘল আধিপত্য স্থাপনে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাদি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়।

সারসংক্ষেপ

সম্রাট আকবর বাংলায় মুঘল অধিকার ও মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত সেনাপতিরা অনেক চেষ্টা করেও সমগ্র বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত বাংলার পূর্বাঞ্চলের সামন্ত জমিদাররা মুঘলদের প্রতিরোধ করেন। এদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের কারণে আকবরের সময়কালে মুঘল শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। বার ভূঁইয়াদের সম্পূর্ণভাবে দমন করার কৃতিত্ব সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ইসলাম খান তাঁদেরকে পদানত করার কাজটি সম্পন্ন করেন। সেজন্য তিনি প্রথমে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারদের বিরুদ্ধে একে একে সমর অভিযান পরিচালনা করেন। জমিদারদের শক্তিকে বিধ্বস্ত করে তিনি এ অঞ্চলে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান উল্লেখ্যযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুলকরিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০–১৮৫৭ খ্রি.)*।
২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৩. Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1(A)
৪. J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol. II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঈসা খান কোন অঞ্চলের জমিদার ছিলেন?
(ক) সপ্তগ্রাম (খ) ভুলুয়া
(গ) সোনারগাঁও (ঘ) চন্দ্রদ্বীপ।

২। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে যশোহরের জমিদার কে?
(ক) সত্রজিত (খ) কেদার রায়
(গ) মুসা খান (ঘ) প্রতাপাদিত্য।

৩। ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় কত খ্রি.?

(ক) ১৬০৮ খ্রি. (খ) ১৬১০ খ্রি.
(গ) ১৬১১ খ্রি. (ঘ) ১৬১৩ খ্রি.।

৪। ভুলুয়ার জমিদার অনন্ত মানিক্য মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে কোথায় পলায়ন করেন?
(ক) আরাকানে (খ) আসামে
(গ) ত্রিপুরায় (ঘ) ঢাকায়।

৫। লক্ষ্মীনারায়ণ কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
(ক) কাছাড় (খ) কোচবিহার
(গ) আসাম (ঘ) কামরূপ।

৬। সুবাদার ইসলাম খান কত বছর বয়সে মারা যান?
(ক) ৩৩ বছর (খ) ৩৭ বছর
(গ) ৪২ বছর (ঘ) ৪৩ বছর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাংলার বার ভূঁইয়া বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?
২। বার ভূঁইয়াদের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল?
৩। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বার ভূঁইয়াদের জমিদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল?
৪। বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণের পূর্বে সুবাদার ইসলাম খান কি ধরনের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। কারা বার ভূঁইয়া নামে বাংলার ইতিহাসে পরিচিত? কিভাবে তাঁদের উৎপত্তি হয়?
২। সুবাদার ইসলাম খান কিভাবে বার ভূঁইয়াদের দমন করেছিলেন?
৩। বার ভূঁইয়া বলতে কাদেরকে বুঝায়? কিভাবে তাঁদেরকে দমন করা হয়?

পাঠ - ৩

শায়েস্তা খান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি–

- *বাংলা প্রদেশে আগমনের পূর্বে শাসনকার্যে শায়েস্তা খানের পূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *বাংলায় তাঁর সুবাদারী শাসনামলে আরাকানীদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম বিজয় এবং দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা পর্যালোচনা করতে পারবেন;*
- *ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ ও সংঘর্ষের বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *সর্বোপরি সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খানের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।*

শায়েস্তা খানের সুবাদারী বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মীর জুমলার মৃত্যুর পর অস্থায়ীভাবে এ প্রদেশের শাসক ছিলেন বিহারের শাসনকর্তা দাউদ খান। পরে সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠান। সম্পর্কের দিক হতে তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা ও মমতাজ মহলের ভাই।বাংলায় আসার আগে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থেকে শায়েস্তা খান শাসনকার্যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং একজন ভালো যোদ্ধা ও কূটনীতিক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। বিহার, গুজরাট ও মালবের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি স্বীয় প্রতিভার যে স্বাক্ষর রাখেন সেজন্য মুঘল সিংহাসন লাভের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে আগ্রার সুবাদার নিয়োগ করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা নেতা শিবাজীকে দমনের জন্য সম্রাট তাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। শায়েস্তা খান শিবাজীর রাজধানী পুনা অধিকার করেন এবং মারাঠাদের অনেকগুলো দুর্গ দখল করে নেন। তিন বছর পর সম্রাটের নির্দেশে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মীর জুমলার মৃত্যুর পর সুদূর বাংলা প্রদেশে একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসনকর্তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তিনি যখন বাংলায় আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি এখানে নিজে কোন যুদ্ধে অংশ না নিলেও তাঁর পুত্ররা বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং শাসন পরিচালনা করেন। একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ও দক্ষ শাসক হিসেবে শায়েস্তা খান সমর নীতি ও শাসন বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলায় সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সুবাদারী শাসনকাল দুপর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম দফায় ১৬৬৪ খ্রিঃ থেকে ১৬৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং শেষে ১৬৭৯ খ্রিঃ থেকে ১৬৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন। মধ্যে প্রথমে আজম খান কোকা কয়েক মাস এবং তাঁর পরে শাহজাদা মুহাম্মদ আযম এক বছরের অধিক সময়ে এখানে সুবাদারীর দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, শাহজাদা আযম ঢাকার লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছিলেন, যদিও তিনি তা শেষ করতে পারেননি।

শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়

বাংলায় শায়েস্তা খানের সুবাদারীর অনন্য সাধারণ ও বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ চট্টগ্রাম বিজয়। স্বাধীন সুলতানি আমলের পরে চট্টগ্রাম দীর্ঘ দিন আরাকানের অধীনে থাকে। সুবাদার ইসলাম খান চিশতী চট্টগ্রাম ছাড়া সারা বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আরাকানের রাজা তাঁর রাজ্যের সীমান্তে মুঘল শক্তির বিস্তৃতি সুনজরে দেখেনি এবং এ কারণে বার বার সীমান্ড় অতিক্রম করে মুঘল এলাকায় হানা দেয় ও লুটতরাজ করে। আরাকানিদের শক্তিশালী নৌবহর থাকায় মেঘনা অববাহিকার ভিতর দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত আসতে তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। সে কারণে চট্টগ্রাম জয় করে সুবা বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করা তাঁর কর্তব্য বলে শায়েস্তা খান মনে করেন। দ্বিতীয়ত, আরাকানী মগ ও ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত পর্তুগিজ জলদস্যুরা মিলিত হয়ে প্রায়ই মুঘল এলাকায় বিশেষ করে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে হানা দিত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। তাছাড়া এরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু লোককে বন্দি করে নিয়ে গিয়ে দাসরূপে বিক্রি করতো। মগরা অনেককে আরাকানে নিয়ে পুরুষদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত ও মেয়েদের দাসী করে তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতো। এদের নির্যাতন থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে রক্ষাও মুঘলদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও সুবাদার শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম আক্রমণের অন্য একটি কারণ ছিল। শায়েস্তা খান বাংলায় পৌঁছার আগে আরাকানের রাজা মুঘল ভূখন্ডের অভ্যন্তরে সামরিক তৎপরতার মহড়া দেন এবং মেঘনা অববাহিকায় মুঘল নৌবাহিনীকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন।

শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি মুঘল নৌবাহিনীকে পুনর্গঠন এবং নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের মোকাবেলার উদ্দেশ্য বহু রণতরী নির্মিত হয় এবং বিভিন্ন স্থান হতে আরো রণতরী সংগ্রহ করা হয়। শায়েস্তা খান দক্ষ নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করে নৌবাহিনীর দায়িত্ব দেন এবং এক বছরের মধ্যে ৩০০ রণতরী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। আরাকান রাজের হাত থেকে সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম জয় করা এ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল। ইতোমধ্যে দিলাওয়ার নামে মুঘল নৌ-বহরের একজন পলাতক নৌ-সেনাপতি আরাকানীদের কাছ থেকে সন্দ্বীপ অধিকার করে সেখানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। শায়েস্তা খানের নির্দেশে মুঘল নৌ-সেনাপতি ইবন হোসেন তার নৌ-বহর নিয়ে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। দিলাওয়ার বীরত্বের সঙ্গে বাধা দিলেও শেষে পরাজিত ও বন্দি হন। মুঘল সৈন্যরা সন্দ্বীপ দখল করে নেয়। এ সময় শায়েস্তা খান কূটকৌশলের সাহায্যে আরাকান অঞ্চলের পর্তুগিজদের তাঁর পক্ষে আনার উদ্যোগ নেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে পর্তুগিজদের সাহায্য ছাড়া আরাকানের মগ নৌ-সেনারা মুঘলদের জন্য তেমন ভয়ের কারণ ছিল না। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে আরাকানের পর্তুগিজদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে মুঘল নৌবাহিনীতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। সে কারণে আরাকানের সব পর্তুগিজ এক সঙ্গে ৫০টি জাহাজে করে তাদের সব ধন-রত্ন ও অস্ত্রশস্ত্র সহ মুঘল এলাকায় এসে পড়ে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে তারা ভুলুয়ায় পৌঁছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বহু ফিরিঙ্গীদের মুঘল নৌবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শায়েস্তা খান ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জয়ের জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। সুবাদারের বড় পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান অভিযানের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি স্থলপথে সাড়ে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হন। নৌবাহিনী পরিচালনা করেন সেনাপতি ইবন হোসেন। পর্তুগিজ ক্যাপ্টেনরা তাদের ৪০টি রণতরী সহ মুঘল নৌ-বহরের সঙ্গে যোগ দেয়। মগ নৌবাহিনী কর্ণফুলি নদীতে মুঘলদেরকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু ইবন হোসেনের নৌ-সেনাদের প্রবল আক্রমণে আরাকানিরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং তাদের ১৩৫টি রণতরী মুঘল বাহিনীর হস্তগত হয়। এরপর মুঘলরা নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ করে। একই সময়ে বুজুর্গ উমেদের স্থলবাহিনী

চট্টগ্রামের নিকটবর্তী হয়। মাত্র এক দিন যুদ্ধের পর মগ সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খান ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে চট্টগ্রাম দুর্গে প্রবেশ করেন। এখানে অনেক বাঙালি বন্দি ছিল, তাদের মুক্তি দেয়া হয়। চট্টগ্রামের শাসনভার ন্যস্ত করা হয় একজন মুঘল ফৌজদারের ওপর এবং সম্রাটের নির্দেশে এই স্থানের নামকরণ হয় ইসলামাবাদ।

কোচবিহার ও সীমান্ত সম্পর্কিত ব্যবস্থা

মীর জুমলা কোচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করলেও তা পরে মুঘল শক্তির হাতছাড়া হয়ে যায়। কোচবিহারের আদিবাসী প্রজারা মুঘলদের প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলে পার্বত্যাঞ্চলে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত ও রাজ্যচ্যুত রাজা প্রাণনারায়ণ সে সুযোগে কোচবিহার পুনর্দখল করেন। শায়েস্তা খান রাজমহলে এসেই ঘোষণা দেন যে, তিনি নিজে কোচবিহার পুনরুদ্ধার করে দুর্বিনীত রাজাকে শাস্তি দেবেন। এতে প্রাণনারায়ণ ভীত হয়ে শায়েস্তা খানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করতে রাজী হন। প্রাণনারায়ণের উত্তরাধিকারী মধুনারায়ণ মুঘল সম্রাটকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করলে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান তাঁর পুত্র ইবাদত খানকে কোচবিহার অভিযানে পাঠান। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মধুনারায়ণ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। কোচবিহার পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং ইবাদত খান এর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

শায়েস্তা খান পার্শ্ববর্তী পার্বত্য রাজ্যগুলোর হামলা থেকে বাংলা সুবাকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোচবিহারের পশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা সংলগ্ন পার্বত্য দেশ মোরং রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। মুঘলরা কোচবিহার আক্রমণ করলে সেখানকার পলাতক সেনাপতি ও সৈন্যরা মোরং রাজ্যে আশ্রয় নিতো। শায়েস্তা খান তা উপলব্ধি করে সে রাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দেন। মোরং-এর রাজা পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিয়মিত কর দিতে অঙ্গীকার করেন। মীর জুমলার আসাম অভিযানের সময় জয়ন্তিয়ার রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং শ্রীহট্টে উৎপাত শুরু করেন। কিন্তু শায়েস্তা খান বাংলায় আসার পর তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সুবাদারকে হাতি উপহার দেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তিয়ার রাজা পুনরায় সিলেটে গোলযোগ সৃষ্টি করলে শায়েস্তা খান তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন।

ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক থেকে ভারতবর্ষে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করলেও বাংলায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিলম্ব ঘটে। তারা ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার বালেশ্বর ও হরিহরপুরে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু তখনো বাংলায় তাদের ব্যবসা ছিল খুবই সামান্য এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতির তেমন সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়নি। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের আকর্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে যখন সুবাদার শাহ সুজা তাদেরকে বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার দেন। অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে কোম্পানি তাদের ব্যবসা দ্রুত সম্প্রসারণ করতে থাকে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে, ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কাসিম বাজার ও পাটনায়, ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এবং আরো পরে রাজমহল ও মালদহ সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম এত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় যে, ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে তাদের ব্যবসার মূলধন ছিল মাত্র দশ হাজার পাউন্ড, ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তা দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউন্ডে উন্নীত হয়। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ইংরেজ কোম্পানি সুজার কাছ থেকে পাওয়া

বিশেষ সুবিধার কারণে বাণিজ্য কর হিসেবে বার্ষিক তিন হাজার টাকাই দিতো। এতে মুঘল সরকার ন্যায্য শুল্ক হতে বঞ্চিত হয় এবং রাজকোষের প্রচুর ক্ষতি হয়। তাছাড়া শুল্কের বিভিন্নতা হেতু বাণিজ্যের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যান্য দেশী ও বিদেশী বণিকেরা। উল্লেখ্য যে, সুজা একজন সুবাদাররূপে ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এ সুবিধা দেননি।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সকল ব্যবসায়ীদের ওপর একই হারে শুল্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি ইংরেজ বণিকদের বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা রহিত করেন এবং সকল ব্যবসায়ীর জন্য পণ্য-দ্রব্যের শতকরা ৩.২৫ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করেন। এতে ইংরেজ বণিকরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তারা শুল্ক ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। কোন কোন সময় উৎকোচের বিনিময়ে কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা চলতে থাকে। ইংরেজ বণিকদেরও মুঘল সরকারের শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। শুল্ক আদায়ের জন্য তারা অনেক সময় ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো, তাদের বাণিজ্য পণ্য ও নৌকা আটক করে রাখতো বা অবৈধ সুবিধা নিত। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর ইংরেজ কুঠির এজেন্ট উইলিয়াম হেজেস সুবাদার শায়েস্তা খানের নিকট এ জাতীয় অভিযোগ করলে তিনি তা প্রতিকারের আশ্বাস দেন। তথাপি শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে মুঘল কর্মচারীদের সাথে ইংরেজদের বিরোধ ও মনোমালিন্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ফলে অবস্থা এমন হয় যে, ইংরেজগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সামরিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে থাকে। ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে সৈন্য ভর্তি কয়েকটি জাহাজ ভারতে পৌঁছে এবং এর তিনটি প্রেরিত হয় হুগলীতে। শায়েস্তা খান এ সংবাদ পেয়ে স্থানীয় ফৌজদারকে হুগলীতে সৈন্য সমাবেশ করার নির্দেশ দেন।

মুঘল কর্তৃপক্ষ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপটে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। হুগলী শহরে তিনজন ইংরেজ সৈন্য আক্রান্ত হবার ঘটনা থেকে এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। মুঘল ফৌজদার আবদুল গনি হুগলী শহর রক্ষায় সক্ষম হলেও ইংরেজরা এ শহরের অধিকাংশ স্থান পুড়িয়ে দেয়। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আত্মরক্ষার্থে হুগলী ত্যাগ করে সুতানটিতে আশ্রয় নেয়। এখানকার ইংরেজ এজেন্ট জব চার্নক সুবাদার শায়েস্তা খানের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করেন। কোনরূপ সমঝোতা না হওয়ায় ইংরেজরা সুতানটি ত্যাগ করে হিজলীর দিকে চলে যায় এবং হিজলী দুর্গ দখল করে। শায়েস্তা খান সেনাপতি আবদুস সামাদের অধীনে বার হাজার সৈন্য পাঠান। মুঘল বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে ইংরেজরা হিজলী দ্বীপ ত্যাগ করে মাদ্রাজের পথে চলে যায়। এভাবে শায়েস্তা খান ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্য তথা বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি পুনরায় (আগস্ট, ১৬৮৭ খ্রি:) ইংরেজ বণিকদের বাংলায় আসার অনুমতি দেন। কিন্তু এ সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। ফলে শায়েস্তা খান তাঁর অনুমতি প্রত্যাহার করেন এবং জন চার্নক পুনরায় সুতানটি ত্যাগ করেন। ইংরেজ নৌ-বহরের ক্যাপ্টেন হীথ উড়িষ্যার বালেশ্বর আক্রমণ করে তা দখল করে। তিনি কয়েকটি জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর অধিকারের পরিকল্পনা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। ইতোমধ্যে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান বদলী হয়ে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব মূল্যায়ন

শায়েস্তা খানের সুবাদারী বাংলার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী শাসক। প্রজাদের সুখ-শান্তির দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি আরাকানী মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার ও লুটতরাজ থেকে বাংলার অধিবাসীদের রক্ষা করেন। চট্টগ্রাম বিজিত হওয়ার পর ১০ হাজার

বাঙালি বন্দি মুক্তি লাভ করে। শায়েস্তা খান আলেম, সুফি ও উচ্চ বংশীয় অনেককে লাখেরাজ জমি দান করেন এবং বিধবা ও দুঃস্থদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে বাংলা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এ সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসায় বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাস পায়। তাঁর সময়ে খাদ্য-শস্যের মূল্য এত সস্তা হয় যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

চট্টগ্রাম বিজয় ছাড়াও শায়েস্তা খান কোচবিহার পুনর্দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁর ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরোধিতা করার সাহস দেখাননি। তিনি ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্যেরও সমুচিত জবাব দেন। শায়েস্তা খান ঢাকায় অনেক ইমারত নির্মাণ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে ছোট কাটরা, হোসেনী দালান, চকবাজার মসজিদ, লালবাগ দুর্গের পরী বিবির মাজার, রায়ের বাজারের সন্নিকটে সাত গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারসংক্ষেপ

শায়েস্তা খানের সুবাদারী বাংলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। মীর জুমলার মৃত্যুর পর বাংলা প্রদেশে একজন দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ শাসনকর্তার প্রয়োজন ছিল। এ কথা উপলব্ধি করে সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। শায়েস্তা খানের আমলে চট্টগ্রাম বিজিত হয় এবং তিনি বাংলার সীমান্ত রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সুবাদার শায়েস্তা খান শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধন করেন। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক তৎপরতাকে উৎসাহিত করলেও ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের তিনি সমুচিত জবাব দেন। শায়েস্তা খান তাঁর সুবাদারী শাসনকালে রাজধানী ঢাকায় অনেকগুলো ইমারত নির্মাণ করে খ্যাতি লাভ করেন। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকরা তাঁর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*
২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৩। Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1 A.
৪। J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol.II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শায়েস্তা খান সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের কে ছিলেন?
(ক) চাচা (খ) মামা
(গ) নানা (ঘ) ভাই।

২। শিবাজী কে ছিলেন?
(ক) পাঠান সর্দার (খ) পর্তুগিজ জলদস্যু
(গ) মারাঠা নেতা (ঘ) মুঘল সেনাপতি।

৩। কত বছর বয়সে শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন?

(ক) ৬০ বছর (খ) ৬২ বছর
(গ) ৬৩ বছর (ঘ) ৬৫ বছর।

৪। লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজ কে শুরু করেন?
(ক) মীর জুমলা (খ) শাহজাদা আযম
(গ) শায়েস্তা খান (ঘ) ইবাদত খান।

৫। ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা কোন জাতিভুক্ত ছিল?
(ক) পর্তুগিজ (খ) ইংরেজ
(গ) ফরাসি (ঘ) দিনেমার।

৬। চট্টগ্রাম বিজয়ের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
(ক) ইবাদত খান (খ) ইসলাম খান
(গ) দিলাওয়ার (ঘ) বুজুর্গ উমেদ খান।

৭। ঢাকায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৬৩৩ খ্রিঃ (খ) ১৬৫৮ খ্রিঃ
(গ) ১৬৬৮ খ্রিঃ (ঘ) ১৬৭২ খ্রিঃ।

৮। বাংলায় শায়েস্তা খানের সুবাদারী শাসন কখন শেষ হয়?
(ক) ১৬৮৮ খ্রিঃ (খ) ১৬৮৯ খ্রিঃ
(গ) ১৬৯০ খ্রিঃ (ঘ) ১৬৯২ খ্রিঃ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে শায়েস্তা খানের সম্পর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
২। শায়েস্তা খানের কোচবিহার ও সীমান্ত সম্পর্কিত ব্যবস্থা বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলার সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
২। ইংরেজ ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুবাদার শায়েস্তা খানের বিরোধের কারণ ও ফলাফল পর্যালোচনা করুন।
৩। শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের বর্ণনা দিন।

পাঠ - ৪

মুর্শিদকুলী খান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মুর্শিদকুলী খানের প্রাথমিক জীবন ও তাঁর কর্মময় জীবনের উন্নতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বাংলার সুবাদার হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন;*
- *তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *বিদেশী বণিকদের প্রতি তাঁর নীতি সম্পর্কে জানবেন;*
- *সর্বোপরি একজন শাসক হিসেবে মুর্শিদকুলীর মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।*

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের যে অবক্ষয় শুরু হয় সে সময় বাংলা প্রদেশে স্বীয় প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা গুণে যিনি নিজেকে একজন সফল শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি হলেন বাংলার দিওয়ান এবং মুঘল সুবাদার মুর্শিদকুলী খান। সাধারণ অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করে শেষে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজস্ব ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং কর্মদক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা বাংলার সুবাদার পদে উন্নীত হন। তাঁর জন্ম দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। ছোট বেলায় হাজী সফী ইস্পাহানি নামে পারস্যের এক মুসলমান তাঁকে কিনে নেন এবং তাঁর নাম দেন মুহাম্মদ হাদী। হাজী শফির নিকট তিনি রাজস্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং এক সময় তাঁর সঙ্গে ইরান চলে যান। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে হাজী শফির মৃত্যু হলে মুহাম্মদ হাদী দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। রাজস্ব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁকে হায়দ্রাবাদের দিওয়ান এবং পরে ইয়ালকুন্ডলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সম্রাট তাঁর কর্মদক্ষতায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে করতলবখান উপাধি দেন এবং ১৭০০ খ্রি. তাঁকে বাংলার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের দিওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। সে সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহজাদা আজিম উদ্দিন। মুহাম্মদ হাদীকে একই সঙ্গে মকসুদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদারের দায়িত্বও দেয়া হয়। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে উড়িষ্যা প্রদেশের দিওয়ান হিসেবে নিয়োগ করেন এবং মুর্শিদকুলী খান উপাধিতে ভূষিত করেন। মুর্শিদকুলীর বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতার ওপর সম্রাটের পূর্ণ আস্থা ছিল। সেজন্য আওরঙ্গজেব তাঁর ওপর বাংলা সুবার দায়িত্ব ছাড়াও অন্য প্রদেশের শাসনকার্যের ভার দেন। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার এবং পরের বছর বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত মুর্শিদকুলী বাংলার দিওয়ান ছিলেন এবং এ সময় রাজস্ব বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা ও সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর চেষ্টায় পূর্বেকার রাজস্বের ঘাটতি দূর হয় এবং রাজস্ব উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। প্রতি বছর এক কোটি টাকার ওপর রাজস্ব আদায় করে তিনি সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। ফলে সম্রাট তাঁর ওপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অতিরিক্ত দায়িত্বও তাঁকে প্রদান করা হয়। কিন্তু সুবাদার শাহজাদা আজিম উদ্দিনের

সঙ্গে মুর্শিদকুলীর সম্পর্ক ভাল না থাকায় একবার তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র ঘটে। সুবাদারের অবৈধ বাণিজ্যে অর্থ উপার্জনের বিরোধিতা করায় তিনি মুর্শিদকুলীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় একদল সৈন্য তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে একদিন দিওয়ানের পথ রোধ করার চেষ্টা করে। মুর্শিদকুলী উক্ত ঘটনার জন্য সুবাদারকে দায়ী করেন এবং সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি রাজস্ব দফতর ঢাকা থেকে মকসুদাবাদ স্থানান্তর করেন (১৭০৩ খ্রি:)। মুর্শিদকুলীর নামানুসারে এর নাম রাখা হয় মুর্শিদাবাদ।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে মুঘলদের মধ্যে উত্তরাধিকারের লড়াই শুরু হয়। এ সময় দুই বছরের বেশি সময়কালে মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার দিওয়ানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে পুনরায় বাংলার দিওয়ান নিয়োগ করা হয়। ফররুখশিয়ার যখন সম্রাটের পদে আসীন হন (১৭১৩ খ্রি:), তখন মুর্শিদকুলীকে বাংলার নায়েব সুবাদারের দায়িত্ব দেয়া হয়। এক বছর পর তিনি উড়িষ্যার সুবাদারীর পদ লাভ করেন এবং তাঁকে জাফর খান উপাধি দেয়া হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী বাংলার সুবাদার হন। কার্যত এ সময় থেকেই বাংলার নবাবী আমলের শুরু।

রাজস্ব প্রশাসনে মুর্শিদকুলী যেমন দক্ষ ছিলেন, সুবাদার হিসেবেও তিনি তেমনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁর সুশাসনে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান ছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। শাসনকার্যে স্বীয় পরিবার, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং অনুগতদের নিযুক্ত করে তিনি সকল ক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন।রাজস্ব বিভাগে হিন্দু কর্মচারীদের প্রাধান্য ছিল। শাসন বিভাগ, বিচার ও সেনাবাহিনীতে মুসলমানগণ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো লাভ করেন। মুর্শিদকুলী একজন প্রজাহিতৈষী ও ন্যায় পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনে অতি সাধারণ প্রজাও অত্যাচার হতে নিরাপদ ছিল। অত্যাচারীকে তিনি এরূপ কঠোর শাস্তি দিতেন যে, কেউ অত্যাচার করার সাহস পেতো না। ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ্ মন্তব্য করেন যে, তাঁর কঠোর অনুশাসন ও পক্ষপাতহীন বিচারের কারণে বাঘ ও মেষ একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতো এবং বাজপাখি ও চড়ুই একই নীড়ে বাস করতো। জনগণের মঙ্গলের জন্য তিনি কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা নেন। তাছাড়া খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে মজুতদারী নিষিদ্ধ করা হয় এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার

মুর্শিদ কুলী খানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। বাংলায় এসে তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা দেখতে পান। তখন দেশের প্রায় সমগ্র ভূভাগ কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর স্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। এর ফলে ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারের আয় ছিল না বললেই চলে এবং বাণিজ্য শুল্কই ছিল রাজকোষের আয়ের প্রধান উৎস। তাছাড়া ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য ভূমি জরিপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। জমিদাররা সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতেন এবং তাঁরা প্রজাদের নিকট হতে নিজেদের নির্ধারিত হারে খাজনা আদায় করতেন। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার এ দুর্দশা দেখে তিনি রাজস্ব সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

প্রথমে তিনি কর্মচারীদের জায়গীরগুলোকে সরকারের খাস জমিতে পরিণত করেন এবং তাদেরকে উড়িষ্যা প্রদেশে জায়গীর প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ভূমি জরিপের মাধ্যমে প্রজাদের দেয় খাজনা নির্ধারিত করে দেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারদের সঙ্গে ভূমির বন্দোবস্ত করা হয়। টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থার মতো তিনি জমির উর্বরতা শক্তি, কয়েক বৎসরের উৎপন্ন শস্যের বাৎসরিক গড় ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে এক-তৃতীয়াংশ শস্য ভূমিকর হিসেবে নির্ধারণ করেন। এভাবে কয়েক বছরের শস্যের মূল্যের বাৎসরিক গড়

নির্ণয় করে টাকায় বিঘাপতি খাজনার পরিমাণ নিরূপণ করেন। প্রজরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শস্য বা টাকায় খাজনা দিতে পারতো। জমিদার বা ইজারাদার কর্তৃক প্রজাদের নিকট হতে নির্ধারিত হারের বেশি ভূমিকর দাবি করা নিষিদ্ধ হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী আমিলদের রাজস্ব আদায়ের খরচ হ্রাস করা হয়। ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত ও তা সংগ্রহের নিমিত্তে সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলায় ভাগ করা হয়। মুর্শিদকুলী কর্তৃক প্রবর্তিত উপর্যুক্ত পদ্ধতির রাজস্ব ব্যবস্থা 'মাল জামিনী' নামে অভিহিত।

মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের পাশাপাশি রাজস্ব আদায় করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তিনি ইজারাদারদেরকে তাদের ওপর নির্ধারিত রাজস্ব ১২ কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। তিনি আদায়কৃত সরকারি রাজস্বের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি যথাযথভাবে গড়ে তোলেন। গ্রাম্য পাটোয়ারী, আমিল, কানুনগো, দিওয়ান সকলের ক্ষেত্রেই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়। রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখার ব্যাপারে অনিয়ম বা শৈথিল্য উপেক্ষা করা হতো না এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। পূর্বে জমিদারদের নিকট হতে যে রাজস্ব আদায় হতো তা অনিশ্চিত ছিল। মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় সরকারি আয় শুধু নিশ্চিতই হয়নি, বরং তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পূর্বে বাংলায় রাজস্ব ঘাটতি হতো। মাল জামিনী ব্যবস্থা প্রচলনের পর পূর্বেকার রাজস্ব ঘাটতি দূর হয় এবং রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। মুর্শিদকুলীর রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রজারাও উপকৃত হয়। ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট হারেই খাজনা আদায় করতেন এবং কোনরূপ অতিরিক্ত কর আদায় নিষিদ্ধ ছিল। ফলে প্রজাদের কর দেয়ার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে।

কেউ কেউ মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িক ইতিহাস লেখক সলিমুল্লাহ লিখেন যে, মুর্শিদকুলী রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখার ক্ষেত্রে খুব কড়াকড়ি করতেন। রাজস্ব বাকি পড়লে তিনি জমিদার, আমিল, কানুনগো ও মুৎসুদ্দিদের দিওয়ানখানায় বন্দি করে রাখতেন। তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অমানবিক শাস্ড়ি দানের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আধুনিককালের ঐতিহাসিকগণ তাঁর বর্ণনাকে অতিরঞ্জন বলে বিবেচনা করেন। তবে এটা ঠিক যে, মুর্শিদকুলী খেলাপি কিছু কিছু জমিদারদের শাস্তি দেন। তাদের বদলে তিনি কয়েকজন নতুন হিন্দু জমিদার বা ইজারাদারদের জমি দেন। এতে বাংলায় এক নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং বাংলার সমাজ বিন্যাসে পরিবর্তন সাধিত হয়।

বিদেশী বণিকদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

মুর্শিদকুলী খান যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশের সমৃদ্ধি বাণিজ্যের উন্নতির ওপর নির্ভর করে। সেজন্য তিনি সব ধরনের ব্যবসায়ীকে বাণিজ্য প্রসারে উৎসাহ দিতেন। তিনি বিশেষ করে ইরানি বণিকদের তাদের ব্যবসায়ে উৎসাহ দিতেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সময় বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। সম্রাট ফররুখশিয়ার ওলন্দাজ বণিকদের বাণিজ্যিক সুবিধা দেবার স্বার্থে তাদের ক্ষেত্রে বাণিজ্য শুল্ক ২% ধার্য্য করেন। মুর্শিদকুলী ফরাসি বণিকদেরও অনুরূপ সুবিধা দেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকরা মুঘল সম্রাটের নিকট হতে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তাদেরকে সমগ্র প্রদেশে শুল্কমুক্ত ব্যবসার অধিকার দেয়া হয়। তাছাড়া কলিকাতার সন্নিকটে ৩৮টি গ্রামের জমিদারী সনদ লাভের অনুমতিও তাদের দেয়া হয়। বিদেশী বণিকদের বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করলেও তারা যেন দেশের স্বার্থ নষ্ট করতে না পারে সেদিকে সুবাদারের কড়া নজর ছিল। সেজন্য তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ফররুখশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী সব সুবিধা দেননি।

মুর্শিদকুলীর কৃতিত্ব

মুর্শিদকুলী খানের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সামান্য অবস্থা হতে উন্নতি সাধন করে তিনি বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। দিওয়ানের মতো সুবাদাররূপেও তিনি যথেষ্ট শাসন দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর সুশাসনে বাংলায় শান্তি বিরাজমান ছিল। তিনি একজন দক্ষ শাসক ও ন্যায়বিচারক ছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাস লেখক সলিমুল্লাহ লেখেন যে, শায়েস্ত খানের পরে মুর্শিদ কুলীর ন্যায় এরূপ ধর্মপরায়ণ, বিজ্ঞ, বদান্য, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজাদরদী শাসনকর্তা দেখা যায়নি। তিনি খুব শিক্ষিত ছিলেন এবং আলেম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সমাদর করতেন। তাঁর সময়ে বাংলায় কৃষির উন্নতি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং সুবা বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত হয়। ব্যক্তি জীবনে মুর্শিদকুলী একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। তিনি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনি একটি করে মসজিদ নির্মাণ করেন। ঢাকার মসজিদখানি বেগম বাজারে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদে তিনি একটি কাটরা নির্মাণ করেন। এই মহান সুবাদার ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেন।

সারসংক্ষেপ

মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করেন এবং বাংলার মতো মুঘল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশের দিওয়ান এবং সুবাদারীর দায়িত্ব পান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি উন্নতির শিখরে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজস্ব সংস্কারক, প্রজাদরদী শাসক, ন্যায় বিচারক এবং অত্যন্ত যোগ্য ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা। তাঁর সময়ে বাংলার কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। রাজস্বের সংস্কার সাধন করে তিনি বাংলার ঘাটতি রাজস্বের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত সাধনে সক্ষম হন। প্রদেশের সর্বত্র আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সকল ধরনের ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করলেও তিনি ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং প্রদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। কঠোর শাস্তির বিধান ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। ব্যক্তি জীবনে সংযম ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা পালন করে তিনি নিজেকে উন্নত চরিত্রের অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনকালে বাংলা প্রদেশের সার্বিক উন্নতি ঘটে এবং ইতিহাসে তিনি নিজেকে একজন সফল শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন সমসাময়িক ইতিহাস লেখকরা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*
২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৩। Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1(A).
৪। J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol.II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুর্শিদ কুলী খানের জন্ম কোথায়?

(ক) ইরানে (খ) মুর্শিদাবাদে
(গ) দাক্ষিণাত্যে (ঘ) মুলতানে।

২। মুর্শিদকুলী কখন বাংলার দিওয়ান হন?
(ক) ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে।

৩। মুর্শিদকুলী খান যখন বাংলার দিওয়ান পদ লাভ করেন তখন বাংলা সুবার সুবাদার কে ছিলেন?
(ক) শাহ সুজা (খ) শাহজাদা আজিম উদ্দিন
(গ) হাজী শফি ইস্পাহানী (ঘ) ফররুখ শিয়ার।

৪। কখন বাংলার রাজস্ব দফতর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়?
(ক) ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে।

৫। মুর্শিদকুলী খান কখন বাংলার সুবাদার হন?
(ক) ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে।

৬। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কার কি নামে অভিহিত?
(ক) মাল জামিনী (খ) পঞ্চসনা বন্দোবস্ত
(গ) সূর্যাস্ত আইন (ঘ) জমিদারী বন্দোবস্ত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব লাভের পূর্বে মুর্শিদকুলী খান কি কি পদে দায়িত্ব পালন করেন?
২। মাল জামিনী ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিন।
৩। ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি মুর্শিদকুলী খানের নীতি কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সুবাদার হিসেবে মুর্শিদকুলী খানের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
২। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৫

আলিবর্দী খান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আলিবর্দী খানের প্রথম জীবন ও তাঁর বাংলার মসনদ লাভের পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *শাসক হিসেবে আলিবর্দীর ভূমিকা বিশেষত মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করা এবং রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও উন্নতিকল্পে তিনি যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হবেন।*
- *আলীবর্দীর শাসনকালের একটি মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

আলিবর্দী খানের প্রথম জীবন ও তাঁর মসনদ লাভ

নবাব আলিবর্দী খান একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় কর্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসনকর্তা ও রণনিপুণ সেনাপতি। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুঘল রাজশক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও বিপর্যয়কালে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদের মসনদে বসে মারাঠা আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আলিবর্দী খানের প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলী। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি ও ধর্মীয় বিশ্বাসে শিয়া মতাবলম্বী। পিতার সঙ্গে তিনি ও তাঁর ভাই মির্জা আহমেদ ভাগ্যান্বেষণে দিল্লিতে আসেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আযমের অধীনে তাঁরা সামান্য চাকুরি করতেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধে শাহজাদা আযম নিহত হলে তাঁরা চাকুরি হারান এবং পরে বাংলায় আসেন। সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের অধীনে চাকুরির চেষ্টা করে মির্জা মুহম্মদ ব্যর্থ হন এবং অতপর তাঁর পরিবার সহ উড়িষ্যার নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিনের আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেন। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দিন তাঁকে ১০০ টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগের চাকুরিতে নিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে মির্জা মুহম্মদ আলী স্বীয় কর্মক্ষমতা গুণে সবন্তপুরের থানাদার পদে উন্নীত হন এবং ৬০০ অশ্বারোহীর মনসব লাভ করেন। এ সময় তাঁর ভাই মির্জা হাজী আহমেদও উড়িষ্যায় আসেন এবং দুই ভাই শাসনকার্যে সুজাউদ্দিনকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দিনের বাংলার মসনদ লাভের ব্যাপারে তাঁরা কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নতুন নবাব তাঁদের কাজে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি হাজী আহমেদকে তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা ও বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করেন এবং মির্জা মুহম্মদ আলীকে রাজমহলের ফৌজদার নিয়োগ ও তাঁকে আলিবর্দী খান উপাধিতে ভূষিত করেন (১৭২৮ খ্রি:)। এ সময় থেকেই মির্জা মুহম্মদ আলী পরিচিত হন আলিবর্দী খান নামে।

১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দী খান বিহারের নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত হন এবং সুজাউদ্দিনের সুপারিশে সম্রাট তাঁকে পাঁচ হাজারী মনসব প্রদান করেন। এ সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে আলিবর্দী খানের পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বিহারের শাসনকার্যে আলিবর্দী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। ইতোপূর্বে দুর্বল শাসনের সুযোগে জমিদাররা সেখানে অবাধ্য হয় এবং রাজস্ব প্রদানে গড়িমসি করে। আলিবর্দী খান তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। মুঙ্গের জেলার বিদ্রোহী উপজাতিগুলোকেও তিনি শক্তহাতে দমন করেন। এর ফলে আলিবর্দী খানের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে বসেন। সরফরাজ খান আলিবর্দীকে বিহারের নায়েব নাজিম পদে বহাল রাখেন এবং কিছুদিন তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। পরবর্তী সময়ে নবাবের উপদেষ্টাগণ আলিবর্দী খানের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন এবং নবাবকে পরামর্শ দেন আলিবর্দী খানের পরিবারের প্রতিপত্তি ধ্বংস করার জন্য। তাঁদের পরামর্শে নবাব হাজী আহমেদ সহ আলিবর্দীর আত্মীয়-স্বজনদের উচ্চপদ থেকে অপসারণ করেন। তাছাড়া নবাবের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ হাজী আহমেদের সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করেন। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে নবাব সরফরাজ খানের প্রশাসনের প্রতি যাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে আলম চাঁদ ও জগতশেঠ হাজী আহমেদকে নবাবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। হাজী আহমেদ নবাবের উপদেষ্টাদের দ্বারা তাঁর অপমানের কথা অতিরঞ্জিত করে বার বার আলিবর্দী খানকে জানান এবং তাঁকে উত্তেজিত করে তোলেন। এতে আলিবর্দী খান নিজ পরিবারের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আলিবর্দী খান সসৈন্যে পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজমহল পৌঁছে তিনি নবাবকে জানান যে, আপন ভাই ও পরিবারকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং নবাবের প্রতি তাঁর আনুগত্য রয়েছে। তাঁর ভাই হাজী আহমেদ ও পরিবার-পরিজনদের তাঁর কাছে আসার অনুমতি দিতে তিনি নবাবের প্রতি অনুরোধ জানান। আলিবর্দীর অনুরোধে হতবাক হয়েও নবাব তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শে সে অনুরোধ রক্ষা করেন। হাজী আহমেদ আলিবর্দীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে প্ররোচনা দেন যেন তিনি সরফরাজ খানকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদ দখল করেন। অপরদিকে নবাবও তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। নবাবের সাথে আলিবর্দীর আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ থেকে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিরিয়া নামক স্থানে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খান পরাজিত ও নিহত হন। তিন দিন পরে আলিবর্দী খান বিজয় গৌরবে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে মসনদে আরোহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে আলিবর্দী খান সম্রাট মুহম্মদ শাহের ফরমান লাভ করায় মসনদে তাঁর অধিকার বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবাব আলিবর্দী মসনদে আরোহণ করে বাংলায় সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। উড়িষ্যার নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। আলিবর্দী খান তাঁকে দমন করার জন্য ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী হায়দ্রাবাদের নিজামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলিবর্দী খান তাঁর জামাতা সৈয়দ আহমেদকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর জামাতা মির্জা বাকের শীঘ্রই মারাঠা সৈন্যদের সহায়তায় উড়িষ্যার রাজধানী কটক দখল এবং সৈয়দ আহমেদকে বন্দি করেন। এ সংবাদ পেয়ে

আলিবর্দী খান আবার উড়িষ্যায় যান এবং রায়পুর নামক স্থানে এক যুদ্ধে মির্জা বাকেরকে পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪১ খ্রি:)। তিন মাস তাঁর কটকে অবস্থানের ফলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর নবাব শেখ মাসুদ পানিপথীকে উড়িষ্যা প্রদেশের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আলিবর্দী ও মারাঠা আক্রমণ

নবাব আলিবর্দী খানকে তাঁর রাজত্বের বেশির ভাগ সময় মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর কাল তিনি মারাঠা হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ইতিহাসে মারাঠা আক্রমণের ঘটনাবলী বর্গীর হামলা নামে সুপরিচিত। এ সময় বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুর অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠন ও নৃশংসতার শিকার হয়। রাজধানী মুর্শিদাবাদও লুণ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই মারাঠা শক্তি বাংলা ও উড়িষ্যায় হামলা চালায়।নবাব আলিবর্দী খান অবিরাম প্রতিরোধ যুদ্ধে আপোষহীনভাবে হানাদারদের বিতাড়িত করে দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

দাক্ষিণাত্যের মারাঠা রাজ্যের অধিপতি শিবাজীর পৌত্র রাজা শাহুর নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা শক্তি প্রয়োগ ও লুটতরাজের মাধ্যমে চৌথ নামক কর আদায়ের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দিকে হানা দিতে থাকে এবং এ প্রক্রিয়াতে তারা বাংলা পর্যন্ত পৌঁছে। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলা তাঁর প্রধামন্ত্রী ভাস্কর পন্ডিতকে ৪০ হাজার সৈন্য সহ বাংলা আক্রমণ করতে পাঠান। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লুটতরাজ ও অগ্নি-সংযোগ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করলেও ভাস্কর পন্ডিত এ অভিযানে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পরের বছর রঘুজী ভোঁসলা স্বয়ং মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তিনিও ব্যর্থ হন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় মারাঠা আক্রমণকালে ভাস্কর পন্ডিত নিহত হন। চতুর্থ এবং পঞ্চম মারাঠা আক্রমণকালে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। এভাবে মারাঠা শক্তি বার বার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিতে থাকে এবং টানা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে তারা অনিয়মিত যুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাদের আক্রমণে বহু এলাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণ অবর্ণনীয় দুর্দশায় নিপতিত হয়। নবাব আলিবর্দী বৃদ্ধ হলেও বীরত্বের সঙ্গে আপোষহীনভাবে লড়াই করে মারাঠাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেন।

দীর্ঘ ১০ বছরের যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত হয়ে শেষে উভয় পক্ষই শান্তির অন্বেষায় সমঝোতার পথ বেছে নেয়। মারাঠারাও কোন ভূখন্ড লাভ করতে পারেনি এবং তাদের অনেক লোকক্ষয় হয়। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত এক সন্ধি চুক্তিতে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। বাংলার জন্য নবাব রঘুজীকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন এবং বিনিময়ে মারাঠারা বাংলা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। জালেশ্বরের নিকটে সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমান্ত নির্ধারিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আলিবর্দী খান মারাঠাদের অনুগত মীর হাবিবকে তাঁর নায়েব রূপে উড়িষ্যা শাসনের ভার দেন। কিন্তু এক বছর পর মারাঠা সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে এবং রঘুজীর এক সভাসদ মুসলেহউদ্দিন খানকে উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়। এর ফলে উড়িষ্যার ওপর কার্যত বাংলার নবাবের কর্তৃত্ব লোপ পায় এবং মারাঠাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলিবর্দী ও আফগান বিদ্রোহ

মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খানের আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তফা খান বিদ্রোহী হন। তাঁর অধীনে একটি বড় আফগান সৈন্যদল ছিল এবং তিনি এমন ধারণা পোষণ

করতেন যে, নবাব আলিবর্দীর রাজ্যের নিরাপত্তা ও শক্তি আফগানদের বাহুবলের ওপর নির্ভরশীল। নবাবের নিকট তিনি বিহারের নায়েব নাজিমের পদ দাবি করেন। নবাব তাঁর এ দাবি পূরণ না করায় তিনি প্রথমে মুর্শিদাবাদ দখলের পরিকল্পনা করেন এবং পরে পাটনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। বিহারের নায়েব নাজিম জৈনুদ্দিন আফগান বাহিনীর পাটনা আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন এবং তাদেরকে বিহার হতে বিতাড়িত করেন। এ সময় মারাঠা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে মুস্তফা খান পুনরায় পাটনার দিকে অগ্রসর হন। জৈনুদ্দিন তাঁকে ভোজপুরের নিকটে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন (জুন, ১৭৪৫ খ্রি.)। আফগান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এর ফলে প্রথম আফগান বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় আফগান বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে। বিহারের দুই আফগান সেনাপতি শমসের খান ও সরদার খান বিশ্বাসঘাতকতা করে নায়েব নাজিম জৈনুদ্দিন ও তাঁর পিতা হাজী আহমেদকে হত্যা করে পাটনা দখল করে নেয়। তারা জৈনুদ্দিনের স্ত্রী ও আলিবর্দীর কন্যা আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদের বন্দি করে। নবাব এ সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিহার যাত্রা করেন। মারাঠারাও এ সময় বিদ্রোহী আফগানদের সাথে যোগ দিতে অগ্রসর হয়। পাটনার ২৬ মাইল দূরে কালাদিয়ারা নামক স্থানে এক যুদ্ধে আলিবর্দী আফগান ও মারাঠাদের মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করে বিহারে পুনরায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন (এপ্রিল, ১৭৪৮ খ্রিঃ)।

অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যাদি

আলিবর্দী খান তাঁর শাসনকালের ১১ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকায় দেশের উন্নতির দিকে তেমন নজর দিতে পারেননি। মারাঠাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পর তিনি প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মারাঠাদের অত্যাচার ও লুটতরাজের দরুন পশ্চিম বাংলার জনগণের জানমালের প্রভুত ক্ষতি হয় এবং কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। তিনি দ্রুত শহর ও গ্রামগুলোর মেরামত ও পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। ব্যাপক চাষাবাদ সহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের সাথে চুক্তি করা হয় যেন তারা প্রজাদেরকে নিপীড়ন না করেন। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার জন্য নবাব আলিবর্দী বণিক ও ভূস্বামীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা নেন। এর ফলে এক শ্রেণীর হিন্দু জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক

নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই নয়, ওলন্দাজ ও ফরাসি বণিকরাও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। কিন্তু এদের অনেকে অসৎ পন্থা অবলম্বন করে কোম্পানির ব্যবসার নাম দিয়ে নিজেরা ব্যবসা করে এবং বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দেয়। এসব অন্যায় বিষয়ে নবাব আলিবর্দী খান কঠোর মনোভাব পোষণ করলেও তিনি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে বিদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসাহিত করেন। তিনি বিধিমত শুল্ক ছাড়া অধিক অর্থ আদায় করতেন না। কেবল মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সব বণিকদের থেকে অর্থ সাহায্য নিতে বাধ্য হন। ইউরোপীয় বণিকদের সম্ভাব্য সব ধরনের বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়া হলেও নবাব তাদেরকে কোন সামরিক বা রাজনৈতিক সুবিধা দেননি। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দী এক নির্দেশে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ বণিকদেরকে তাঁর রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত হতে এবং দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন।

আলিবর্দী খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

বাংলার মসনদে ১৬ বছর আসীন থাকার পরে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন। সেনাপতি ও শাসক হিসেবে তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বই শুধু দেখাননি, স্বীয় কার্যকলাপ ও চরিত্রগুণে বাংলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি স্বীয় সাহস ও প্রতিভার দ্বারা বাংলার মসনদ লাভে সক্ষম হন। সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। দীর্ঘ ১০ বছর মারাঠা হানাদারদের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করে তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

আলিবর্দী খান শান্তিপ্রিয় ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। জমিদাররা যাতে প্রজাদের ওপর নিপীড়ন করতে না পারে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। সমকালীন ইতিহাস লেখকরা তাঁর চরিত্র গুণ ও ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি উদার, দয়ালু ও ধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। শত্রুর প্রতি তাঁর মহানুভবতার উল্লেখ করে সিয়ার-উল-মুতাখখেরীনের লেখক গোলাম হোসেন তাবাতাবাই তাঁকে 'মহৎপ্রাণ' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন এবং কঠোর সংযম প্রদর্শন করেন। আলিবর্দী খান নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি কবি, পন্ডিত, লেখক ও গুণীদের সমাদর ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সব ধর্মের প্রতি তাঁর সহিষ্ণু মনোভাব ছিল। সে কারণে তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করেন এবং অনেক হিন্দুকে শাসনকার্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তাঁর শাসনামলে বাংলায় ফারসি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক চর্চা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ফারসি সাহিত্য দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ও সমৃদ্ধ হয়।

সারসংক্ষেপ

মুঘল যুগে বাংলায় যে কয়জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে নবাব আলিবর্দী খান অন্যতম। ভাগ্যান্বেষী এই তুর্কি সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় প্রতিভা ও সাহস দ্বারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ অধিকারে সক্ষম হন। মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙ্গনের কালে সুদূর বাংলা প্রদেশকে তিনি অভ্যন্তরীণ ও বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। ১০ বছর টানা লড়াই করেও দুর্ধর্ষ মারাঠা জাতি বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অর্থনৈতিক স্বার্থে ইউরোপীয় বণিকদের তিনি নিজ রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুবিধা দিলেও তাদেরকে এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বা দুর্গ নির্মাণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। আলিবর্দী খান একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সমকালীন ইতিহাস লেখকরা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী ও সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর শাসনামল বাংলার ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*

২। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

৩। Muhammed Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol. 1(A).

৪। J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol.II.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আলিবর্দী খান জাতিতে ছিলেন–
(ক) ইরানি (খ) তুর্কি
(গ) বিহারি (ঘ) পাঞ্জাবি।

২। আলিবর্দী খান কখন বিহারের নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত হন?
(ক) ১৭২৮ খ্রিঃ (খ) ১৭৩১ খ্রিঃ
(গ) ১৭৩৩ খ্রিঃ (ঘ) ১৭৩৯ খ্রিঃ।

৩। সরফরাজ খান কোন যুদ্ধে নিহত হন?
(ক) বক্সারের যুদ্ধে (খ) উদয়নালার যুদ্ধে
(গ) কাটোয়ার যুদ্ধে (ঘ) গিরিয়ার যুদ্ধে।

৪। বাংলায় প্রথম মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়–
(ক) ১৭৩৯ খ্রিঃ (খ) ১৭৪২ খ্রিঃ
(গ) ১৭৪৪ খ্রিঃ (ঘ) ১৭৫১ খ্রিঃ

৫। সিয়ার-উল-মুতাখখেরীনের রচয়িতা কে?
(ক) আমির খসরু (খ) করম আলী
(গ) গোলাম হোসেন তাবাতাবাই (ঘ) ফেরদৌসি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আলিবর্দী খানের প্রথম জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২। মসনদে বসার পর আলিবর্দী খান প্রাথমিকভাবে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিভাবে তিনি ঐগুলো দূর করেন?
৩। আলিবর্দীর শাসনকালে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৪। ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে নবাব আলিবর্দীর সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। নবাব আলিবর্দী খানের প্রথম জীবন ও তাঁর বাংলার মসনদ লাভের পটভূমি আলোচনা করুন।
২। আলিবর্দী খানের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩। নবাব আলিবর্দী খানের চরিত্র ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (ঘ); ৪। (খ); ৫। (খ)।
পাঠ-২ ঃ ১। (গ); ২। (ঘ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (খ); ৬। (ঘ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (গ); ৪। (খ); ৫। (ক); ৬। (ঘ); ৭। (ক); ৮। (ক)।
পাঠ-৪ ঃ ১। (গ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (খ); ৫। (গ); ৬। (ক)।
পাঠ-৫ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (ঘ); ৪। (খ); ৫। (গ)।